পুরুষার্থ

DEBABRATA SAHA

ASSISTANT PROFESSOR OF PHILOSOPHY

H.B.COLLEGE, NALHATI

"যেন প্রযুক্তঃ পুরুষঃ প্রবর্ত্ততে, স পুরুষার্থঃ"। অর্থাৎ যার দ্বারা পুরুষ প্রবর্তিত হয় অর্থাৎ পুরুষ যা পরম কাম্য বলে গ্রহণ করে তাই পুরুষার্থ।[1] পুরুষ + অর্থ = পুরুষার্থ। এখানে অর্থ হল প্রয়োজন। সুতরাং যে বস্তু পুরুষের প্রয়োজন সাধন করে তাই পুরুষার্থ। ভারতীয় নীতিতত্ত্বে পুরুষার্থকে 'সাধ্য' রূপে অভিহিত করা হয়। যা সাধনালব্ধ তাই সাধ্যরূপে বিবেচিত। পুরুষার্থের সহায়ক যে কাম্য বস্তু তা শুধুমাত্র সাধানার দ্বারা লাভ করা যায়। তাই পুরুষার্থ চরম ও পরম মূল্যবান। পুরুষার্থ লাভে মানুষের মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। ভগবদ্ গীতায় ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ – এই চারটি পুরুষার্থ বা পরমকাম্য বস্তুর উল্লেখ আছে। এখানে ধর্ম বলতে সদ্‌গুণ, অর্থ বলতে সম্পদ, কাম বলতে সুখ এবং মোক্ষ বলতে আত্মোপলব্ধিকে বোঝানো হয়েছে। এই চারটি পুরুষার্থের মধ্যে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটি ঐহিক ও পারত্রিক সুখ লাভের উপায় আর মোক্ষ হল পরমার্থ বা পরম পুরুষার্থ। জীবের মূল্য বা পুরুষার্থই ইষ্ট বা কাম্য বস্তু। পুরুষার্থ চতুষ্টয় সম্বন্ধে ভারতীয় ধারণার মূল কাঠামো রচিত হয় বৈদিক যুগে। বেদে ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার ও সামাজিক ধারণার বিবর্তনের যে তথ্য পাওয়া যায় তার মধ্যে দিয়ে চতুর্বর্গের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়। কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে বেদের কোন স্থানেই চতুর্বর্গ বা পুরুষার্থ শব্দের উল্লেখ নেই। পুরাণ ও মহাভারতের যুগ থেকেই পারিভাষিক 'পুরুষার্থ' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে।

---

[1] চার্বাক দর্শনম্ - শ্রী পঞ্চানন শাস্ত্রী, পৃ. ১৬ হইতে উদ্ধৃত

এখন চারটি পুরুষার্থ সংক্ষেপে অলোচনা করা যেতে পারে।

ধর্ম

মানুষ সামাজিক জীব, সভ্যতার সেই আদিকাল থেকে অদ্যাবধি সামাজিক বন্ধনের মধ্যেই মানুষের বড়ো হওয়া, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানো। শারীরিক গঠন ছাড়া মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রায় সবটাই সমাজ থেকে প্রাপ্ত। মানবাকায় বিশিষ্ট হলেও সে মনুষ্য পদবাচ্য হয় না, তার জন্য প্রয়োজন কিছু আন্তর অনুভূতির। সেই আন্তর অনুভূতিলোকে মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকাশই হল ধর্ম। প্রাচীনকাল থেকেই 'ধর্ম' শব্দটি ব্যাপক অর্থে প্রচারিত। সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয়যোগে 'ধর্ম' শব্দটি নিষ্পন্ন, যা একাধিক আভিধানিক অর্থে পূর্ণ। যেমন, শুভাদৃষ্ঠ, পূণ্য, সৎকর্ম, যজ্ঞ, শাস্ত্রাচার, স্বভাব, রীতি ইত্যাদি। 'ধৃ' ধাতুর অর্থ ধারণ করা, সমাজের ও ব্যক্তিত্বের রীতি-নীতি আচার-আচরণের ধারকই হল ধর্ম। অপরপক্ষে 'বিশেষগুণ' বোঝাতেও ধর্ম শব্দটি প্রযুক্ত। ঋগ্বেদের প্রাথমিক যুগে যজ্ঞ অর্থে ধর্ম শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়- ''যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্তদেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্"।[2] যে গুণ শক্তি বা স্বভাব দ্বারা কিছু ধৃত হয় বা যে শক্তি বা স্বভাব কোন কিছুকে ধারণ করে তাকেই ধর্মের সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করেছেন বেদ কর্তারা। আবার সায়নাচার্য 'ধারক কর্ম' অর্থেও ধর্মকে প্রয়োগ করেছেন।[3] ধর্মের আরও একটি অর্থ বেদ কর্তারা উপলব্ধি করেছিলেন, যা হল নিয়ম। বিশ্বের শাশ্বত নৈতিক নিয়ম শৃঙ্খলাকে ঋত বলার প্রচলন ছিল ঋগবেদে।[4] ব্রাহ্মণ যুগে ঋতের অর্থ সংকুচিত হয়ে তা সত্য রূপে ব্যবহৃত হয়। ব্রাহ্মণত্তোর যুগে এই ঋতের স্থান অধিকার করলো ধর্ম। তাই তৈত্তিরীয় আরণ্যকে

---

[2] ঋগ্বেদ – ১৫০/১৬৪/

[3] ঋগ্বেদ – ৭সায়নভাষ্য ,৫/৮৯/

[4] ঐতরেয় ব্রাহ্মণ – ৮১৭ ,১৫ ,১২/৬/

ধ্বনিত হয় –"ধর্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা লোকে ধর্মিষ্ঠং প্রজা উপজীবন্তি ধর্মেণ পাপমপনুদতি ধর্মে সর্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাদ্ধর্মং পরমং বদন্তি"।[5] উপনিষদের যুগে এসে শ্রেয় বা নিঃশ্রেয়স অর্থে ধর্ম শব্দটি প্রচারিত হয়েছে। জাগতিক বিষয়সুখ ছেড়ে পরমাত্মা ভোগরূপ শ্রেয় তত্ত্বের সন্ধানেই ছুটেছেন উপনিষদের ঋষিরা। এই শ্রেয় লাভই ধর্ম রূপে আত্ম প্রকাশ করেছে। সুতরাং শাস্ত্রবিহিত আচার-সদাচার ও মানুষের স্বকীয় শুভচিন্তনও ধর্মরূপে বিবেচিত'। মনুসংহিতাকারের উপলব্ধিতে তা প্রতিফলিত-

"বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।

হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্মস্তন্নিবোধত।"[6]

ধর্মপ্রিয় অশোকের "দেবানাং পিয় পিয়দসি"[7] অনুশাসন ধর্মের নিষ্ঠারূপের পরিচায়ক। আবার কুরুক্ষেত্রের রনাঙ্গনে দাঁড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণের উৎসাহে অর্জুনের "নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা"[8] উপলব্ধি ধর্মের সেই সত্য স্বরূপেরই প্রকাশ। ধর্মের ভাবজগৎ যেমন একজন ছাত্রের অধ্যয়নকে তপস্যায় উন্নীত করে, তেমনি একজন কবি বা দার্শনিকের শ্রেষ্ঠ উপলব্ধিকেও সার্থক করে। সুতরাং ধর্ম হল ব্যক্তিহৃদয়ের সেই আদর্শ, যা তার আন্তর্জগতের অনুভূতিকে বর্হিপ্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দেয়, যা মানবধর্মরূপে অঙ্কুরিত হয়ে বিশ্বধর্মে উন্নীত হয়। কবির ভাষায়-

---

[5] তৈত্তিরীয় আরণ্যক্ ৬৩/১০ -

[6] মনুসংহিতা ২১/

[7] তৃতীয় মুখ্য অনুশাসন, SELECT INSCRIPTIONS, VOL. 1, D.C. SIRCAR.ED. CALCUTTA UNIVERSITY.

[8] গীতা৭৩/১৮ -

"বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নিজের প্রকৃতির মিলটা অনুভব করা সহজ, কেননা সে দিক থেকে কোনো চিত্ত আমাদের চিত্তকে কোথাও বাধা দেয় না। কিন্তু এই মিলটাতেই আমাদের তৃপ্তির সম্পূর্ণতা কখনোই ঘটতে পারে না। কেননা আমাদের চিত্ত আছে, সেও আপনার একটি বড়ো মিল চায়। এই মিলটা বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, বিশ্বমানবের ক্ষেত্রেই সম্ভব।"[9]

এই ধর্মের মূল উদ্দেশ্য হল বিশ্বের রহস্যময়ী শক্তিকে ধরার তীব্র আকুতি। এই আকুতি রূপ পায় নানা জাতি, ভাষা ও ভাবের মধ্য দিয়ে। সেই রহস্যময়ী শক্তি কারো কাছে নিরাকার ব্রহ্ম, কারো কাছে মূর্তিমান ঈশ্বর, কারো কাছে ঈশ্বরকণা, কারো কাছে আবার 'মনের মানুষ'।

ধর্মের আলোচনা করতে গিয়ে যাজ্ঞবল্ক্য যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে বলেছেন – অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দান, দম, দয়া, শান্তি এই নয়টি ধর্মের সাধন। মনুসংহিতায় মনু বলেছেন,

''ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।

ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্।''

অর্থাৎ ধৃতি (ধারণ বা ধৈর্য), ক্ষমা দম (সৎ আচরণ), অস্তেয় (চুরি না করা), শৌচ (দেহ ও মনের শুচিতা), ইন্দ্রিয় নিগ্রহ (ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ), ধী (শাস্ত্র জ্ঞান), বিদ্যা (আত্মজ্ঞান), সত্য ও অক্রোধ এই দশটি ধর্মের লক্ষণ। এই গুলি পালনে মানুষ নৈতিকতার শীর্ষে অবস্থান করে সমাজে অনুসরণীয় হতে পারেন। আর যে সমাজ ধর্মের প্রতি যত শ্রদ্ধাশীল, সে সমাজ তত সুরক্ষিত, যে সমাজ তা নয় সে সমাজ তত নিজের ক্ষতিকারক।

---

[9] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর৪৬ পৃঃ ,আত্মপরিচয় ,

অর্থ

ঋ + থ প্রত্যয় যোগে অর্থ শব্দ নিষ্পন্ন। পুরুষার্থরূপে অর্থ দ্বিতীয় পুরুষার্থ। অর্থ কেবল উপায় কিন্তু উপেয় নয়। অর্থ ধর্মানুকুল হলেই তবেই তা পুরুষার্থ বলে বিবেচিত হয়। জীবের নানাবিধ কাম্য বস্তু আছে এবং সেগুলির সন্তুষ্টি বিধানের জন্য প্রয়োজন অর্থের। অর্থ ছাড়া কাম্য বস্তু লব্ধ হয় না, এমনকি তার সন্তুষ্টি বিধানও হয় না। পুরুষার্থরূপে অর্থকে এমনই হতে হবে যা নিজের যেমন ইষ্ট সাধন করতে পারে তেমনি অপরের অনিষ্ট সাধন না করে। অর্থ তাই একদিকে ইষ্ট সাধক এবং অপরদিকে অনিষ্ট নাশক।

কাম

মানুষ দেহধারী, তাই দেহের প্রয়োজন সাধক বস্তু সে কামনা করে। অর্থাৎ প্রয়োজন সাধক বস্তুর প্রাপ্তি ও ভোগ তার কাম্য। সেজন্য 'কাম' পুরুষার্থের তৃতীয় পুরুষার্থ। 'কাম' হল সংযতভাবে সঙ্গত কামনা সমূহের তৃপ্তি সাধন।

মানুষের মধ্যে দুটি প্রবৃত্তি কাজ করে। একটি জীববৃত্তি এবং অন্যটি বুদ্ধিবৃত্তি। জীববৃত্তির জন্য মানুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় নিম্নতর জৈবিক সত্তা যা বিভিন্ন প্রকার দৈহিক সুখকে পাওয়ার লালসা কাজ করে। কিন্তু মানুষ বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী হওয়ায় শুধুমাত্র যৌনসম্ভোগরূপ কামকে সবসময় কামনা করে না। বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা মানুষ কামকে সংযতভাবে চালিত করে। অসংযত কামাচার মানুষের অন্তঃস্থিত সত্তাকে কালিমালিপ্ত করে – যা পশুসুলভ কাম লালসারই নামান্তর। বিকৃত কাম মানুষকে ভোগের মাধ্যমে ত্যাগের ব্রতে ব্রতী করে তোলে।

মহাভারতে কামকে সঙ্কল্পরূপ মানস-জ্ঞানও বলা হয়েছে। এই কাম সনাতন।[10] কাম মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। কামের থেকে কর্মসংকল্প আর কর্মের সংকল্প থেকে আসে প্রযত্ন। ঈপ্সিত বস্তু লাভের জন্য যত কর্ম করা হয় তার দ্বারা যখন ভগ্য বস্তুকে

---

[10] "সনাতনো হি সঙ্কল্প কাম ইত্যভিধীয়তে" – মহাভারত,১৩/৮৫/১১

পাওয়া যায় তখন যে প্রীতি হয় সেই প্রীতিই কাম। এই কাম সংসারের হেতু। কারণ, বিষয়বাসনাই মানুষকে সংসারে প্রেরণ করে। কামকে পুরুষার্থ বলা হয় কারণ সংসারে যারা ইন্দ্রিয় সুখকে একমাত্র কাম্য ম্নে করে তাঁরা সেই সুখ ভোগ করার জন্যে যে কোন উপায় অবলম্বন করতে প্রস্তুত থাকে। মহাভারতে যযাতির উপখ্যান এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কামের বিশেষত্ব হল চরিতার্থতার জন্য কাম সদাই উন্মুখ। কিন্তু উপভোগের দ্বারা কাম তৃপ্ত হয় না বরং কামনার বৃদ্ধি হয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, কাম অনলের মত দুষ্পূরণীয়।[11] শ্রীমদ্ভগদ্গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আবার নিজেকে 'কামস্বরূপ' বলেছেন – "ধর্মাবিরুদ্ধ ভূতেষু কামোহস্মি ভরতর্ষভঃ"।[12] মনুসংহিতায় বলা হয়েছে –

"কামাত্মতা ন প্রশস্তা ন চৈবেহাস্ত্যকামতা।

কাম্যো হি বেদাধিগমঃ কর্মযগশ্চ বৈদিকঃ।।

সঙ্কল্পমূলঃ কামো বৈযজ্ঞাঃ সঙ্কল্পসম্ভবাঃ।

ব্রতানি যমধর্মাশ্চ সর্বে সঙ্কল্পজাঃ স্মৃতাঃ।।

অকামস্য ক্রিয়া কাচিদ্দৃশ্যতে নেহ কর্হিচিৎ।

যদ্যদ্ধি করুতে কিঞ্চিৎ তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্।।

তেষু সম্যগ্বর্তামানো গচ্ছত্যমরলোকতাম্।

যথা সঙ্কল্পিতাংশ্চেহ সর্বান্ কামান্ সমশ্নুতে।।[13]

মোক্ষ

চারটি পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষ শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। আর অপরাপর পুরুষার্থ গুলি এর সহযোগীমাত্র। মোক্ষ হল জীবন যন্ত্রণা থেকে, অবিদ্যা থেকে, ভবরূপ বন্ধন থেকে,

---

[11] গীতা – ৩/৩৯

[12] গীতা – ৭/১১

[13] মনুসংহিতা – ২/২-৫

আত্মার বন্ধন থেকে চিরমুক্তি। অনাত্মা দেহাতীতে আত্মাভিমানই আত্মার বন্ধন।[14] পদ্মপুরাণে উক্ত হয়েছে যে, কর্মের উৎপত্তিই বন্ধন, আর সুখদুঃখ দায়ক কর্মের নাশই মোক্ষ।[15] 'যোগাবাশিষ্ঠ রামায়ণে' বিষয়ব্যসনযুক্ত তৃষ্ণাকেই বন্ধন ও সর্ব্ববিষয়ব্যসননির্মুক্তিকেই মোক্ষ বলা হয়েছে।[16] উমাস্বাতি বলেছেন যে, "রাগদ্বেষাদিকষায়যুক্ত হয়ে জীব কর্ম যোগ্য পুদ্‌গল গ্রহণ করে, এই পুদ্‌গল গ্রহণই বন্ধন।[17] আর ঐ পুদ্‌গল ত্যাগই মোক্ষ। নিরালম্বোপনিষদ্ - এ বলা হয়েছে, "অনিত্য সাংসারিক সুখদুঃখ এবং অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের প্রতি মমতারূপ বন্ধনের ক্ষয়ই মোক্ষ"।[18] মহাভারতে বাসনার নিবৃত্তিকেই মোক্ষ বলা হয়েছে।[19] চরকসংহিতায় নিঃশেষরূপ বেদনার নিবৃত্তিরূপ অবস্থাকেই মোক্ষ বলা হয়েছে।[20] মোক্ষকে ভারতীয় দর্শনে মুক্তি অপবর্গ, কৈবল্য, নির্বাণ এবং নিঃশ্রেয়স প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু মোক্ষের স্বরূপ নিয়ে ভারতীয় দার্শনিকগণ একমত নন। শূন্যবাদী বৌদ্ধদের মতে আত্মার উচ্ছেদই মোক্ষ। অন্য বৌদ্ধদের মতে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের উদয়ই মোক্ষ। সাংখ্য মতে পুরুষের স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ। বেদান্ত মতে অবিদ্যার নিবৃত্তি বা আত্ম স্বরূপের অবোধই মোক্ষ। [21]

---

[14] সর্ব্বসারোপনিষদ্, ১

[15] পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ২০৪/২৩

[16] যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ, ৫/১৭/৫

[17] তত্তার্থাধিগমসূত্র, ৮/২-৩

[18] নিরালম্বোপনিষদ্

[19] মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৫

[20] চরকসংহিতা, ৪/১/১১৬

[21] চার্বাক দর্শনম, শ্রী পঞ্চানন শাস্ত্রী, পৃ. ১৮ হইতে উদ্ধৃত

সম্ভাব্য প্রশ্নঃ

পুরুষার্থ শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ কী ?

পুরুষার্থ কয় প্রকার ও কী কী ?

বিভিন্ন প্রকার পুরুষার্থ আলোচনা করো ?